গবেষণা
অভিসন্দর্ভের
সারসংক্ষেপ
(Abstract)

উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ

ভূমিকা :

রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) প্রচেষ্টায় 'সতীদাহ প্রথা রদ্' (১৮২৯) আইন প্রচলনের পর কার্যকারণসূত্রে, অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গটি। 'সতীপ্রথা' রদ্ হবার পর সমাজে বাল্যবিধবার সংখ্যা বেড়ে যায়। নিরুপায় বিধবা রমণীদের জীবন হয়ে ওঠে অসুরক্ষিত। এই বিধবাদের একাংশ জড়িয়ে পড়ে সমাজ কলঙ্কে। কেউকেউ কলকাতার বাবুদের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটান। আবার কেউ কেউ আশ্রয়হীন হয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। সমাজে ভ্রূণহত্যার মত অপরাধমূলক কাজ ঘটতে থাকে। এইরকম সমাজ অবক্ষয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সমাজ হিতৈষীরা এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজেন। পরাধীন ভারতবর্ষের আচার সর্বস্ব সমাজ পরিবেশে দাঁড়িয়ে বিধবা-সমস্যা সংকট মোচনে কলম ধরলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। তিনি বিধবা রমণীদের পুনর্বিবাহ দানে উদ্যোগী হলেন। অসহায় বিধবা রমণীদের পরিত্রাণ ও সমাজকে কলুষমুক্ত করতে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ' আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হন। বিধবাবিবাহের পক্ষে সওয়াল করে বিদ্যাসাগর লেখেন, —'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫, ১ম ও ২য় খণ্ড)। দীর্ঘ সামাজিক আলোড়নের পর নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় 'বিধবাবিবাহ' শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় ১৮৫৬ সালের ২৩শে জুলাই। 'বিধবাবিবাহ' আইনত স্বীকৃতি পাওয়ার পর, সমাজের নানান স্তরে, বিশেষত শিক্ষিত মহলে, সাহিত্য চিন্তায়, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উঠে আসে—'বিধবা' প্রসঙ্গ এবং 'বিধবা বিবাহ' প্রসঙ্গটি। উনিশ শতকের বাংলা নাটকে নাট্যকারেরা সামাজিক প্রেক্ষিতে বিধবা চরিত্রদের তুলে ধরেছেন। ভিন্ন বয়সের বিধবাদের ভিন্ন সমস্যা ও দুঃখ কথাকে স্থান দিয়েছেন নাটকে। যা হয়ে উঠেছে সমাজের বহু অসহায় বিধবাদের প্রতিচ্ছবি। প্রসঙ্গত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দীর্ঘ সময়কালে রচিত বাংলা নাটকে উঠে আসা বিধবা প্রসঙ্গ ও তাদের সামাজিক সংকট-সমস্যাকে আমি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে তুলে ধরেছি। আমি আমার গবেষণা সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে চারটি অধ্যায়ে বিভাজন করেছি,—

প্রথম অধ্যায় : উনিশ শতকের সমাজ জীবন, বিধবার সমস্যা ও বিধবা আন্দোলন প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধবা প্রসঙ্গ।

তৃতীয় অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা নাটক : বিষয় ভাবনায় বিধবা প্রসঙ্গ।

চতুর্থ অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বিধবা নারীর সংকট।

প্রথম অধ্যায় : উনিশ শতকের সমাজ জীবন, বিধবার সমস্যা ও বিধবা আন্দোলন প্রসঙ্গ।

উনিশ শতকে রক্ষণশীল বর্ণহিন্দুর দল বিধবা বিবাহকে সুনজরে দেখেননি। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মরা উদার মানসিকতায় 'বিধবা বিবাহে'র বিষয়টি সমবেদনার সঙ্গে দেখেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সমকালীন বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ, বিধবা বিবাহের সমর্থনে, সোচ্চার হয়েছিলেন। অন্যদিকে, গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার শর্ম্মা, শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর দে, প্রমুখ পন্ডিতেরা বিধবা বিবাহকে পরিবার-সমাজ অবক্ষয়ের সূচক হিসাবে দেখেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধবা প্রসঙ্গ।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলে, শিক্ষিত মহলের সাহিত্য চিন্তায়— পক্ষে এবং বিপক্ষে বিধবা বিবাহ এই সামাজিক বিষয়টি কাহিনীর মোড়কে স্থান পেল সাহিত্যে। উনিশ শতকে বিধবার বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের তালিকা বিশাল। সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে বিধবা বিবাহ এই সামাজিক আন্দোলন জাত নানা ঘাত-সংঘাত ও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়টি। একদিকে সংবেদনশীলতা অন্যদিকে কটাক্ষ ও মুখোরোচক প্রণয়কাহিনীর কেন্দ্রিয় বৃত্তে বিধবা চরিত্ররা ঘুরে ফিরে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট—'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের বিধবা যৌবনাবতী রোহিনী, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের রূপসী বিধবা 'কুন্দনন্দিনী' চরিত্রে দেখা গেছে বৈধব্যের কামনাসক্ত রূপ আবার একাধিক নাটকে দেখা গেছে বিধবা নারীর অসহায়তার করুণ বৈধব্য জীবনাচার একাদশী পালনের চিত্র।

তৃতীয় অধ্যায় : উনিশ শতকের বাংলা নাটক : বিষয় ভাবনায় বিধবা প্রসঙ্গ।

১৮৫৬ সালে আইনত বিধবা বিধবা বিবাহ স্বীকৃতি পাবার পর, বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করে নাট্য সাহিত্যে। সমালোচক অশোককুমার মিশ্র লিখেছেন, —*''বিধবা বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদের সুর সবচেয়ে বেশি উচ্চকিত হয়েছিল বাংলা নাট্য শ্রেণীতে।''*

(বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, ১৯৮৮) নাটক যেহেতু মিশ্রশিল্প, সেহেতু এখানে যেমন চরিত্রের সংলাপ আছে তেমনি রয়েছে সংগীত। ফলে বাংলা নাটকের সংলাপ নির্ভরতায় নাট্যকারেরা সরাসরি উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে, কখনও সংগীতের মধ্য দিয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থনে, বিরোধিতায় কিংবা মনোরঞ্জন রঙ্গ-তামাসা করেছেন।

আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে লক্ষ্য করেছি উনিশ শতকে রচিত প্রায় তিরিশটির বেশি নাটকে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা নারীর জীবনাচারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ১৮৫৬ সালের ২৩ শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইনত পাশ হবার পর পরই ওই বছরেরই প্রকাশিত হয় তিনটি নাটক, উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬), রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা মনোরঞ্জন' নাটক (১৮৫৬)ও উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবাদ্বাহ' নাটক (১৮৫৬, সংবাদ ভাস্কর)। সমকালে বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটকটি একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়িত হয় ও জনসমাদর লাভ করে বিপুলভাবে। নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ গ্রন্থে' লিখেছেন,—'' *কলিকাতার সিঁদুরিয়া পট্টিতে গোপাললাল মল্লিকের বাড়িতে মেট্রোপলিটান থিয়েটারে কেশব সেন মহাশয়ের উদ্যোগে ও প্রযোজনায় উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৯, ২৩ শে এপ্রিল।*'' নাটকটি সমকালের মঞ্চাভিনয় বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসকে ও নাটক রচনার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই নাটকের অভিনয়ে বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় : <u>উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বিধবা নারীর সংকট।</u>

বিধবা বিবাহের সমর্থনে লেখা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলাচিত্তচাপল্য' (১৮৫৭) নাটকে দেখানো হয়েছে,—বাল্যবিধবার একাদশী পালনের নিষ্ঠুরতার চিত্র। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলাচিত্তচাপল্য' (১৮৫৭) নাটকে বিধবা বিনোদা আক্ষেপের সঙ্গে জানিয়েছে, —' *ছেলেবেলা শুধু ত, মেয়ে বলে মা-বাবা দূরছাই করেচেন। আমি কুলীনের মেয়ে, মা কি বাপ কখনো একটি কথা বলেননি।... বাপ তো জুতিয়ে বের করে আনলেন, অম্নি 'ওট্ ছুঁড়ি তোর বে' বে ত হল তারপর মাসখানেক পরেই এম্নি হয়েচে। ভাতারের সঙ্গে আলাপ ও হয়নি, পরচেও হয়নি। সেই শুভদৃষ্টির যা দেখা, আর সুতো খুলতে যা ছোঁয়া, সকল হলো পরে পরে, গুটিকতক মন্তর পড়ে এই একাদশী লাভ হলো।*'' হিন্দুধর্ম সংস্কার বশত অনেক হিন্দু বিধবা বৈধব্য জীবনের

আচারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। উনিশ শতকের সমকালে বিধবার পুনর্বিবাহে —অনেক বিধবা নারীর সমর্থন ছিল না। এই ধর্মভীরুতা লক্ষ্য করা যায়, অঘোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিধবা সংকট' (১৮৯০) নাটকে। এ নাটকে দেখানো হয়েছে, ইংরেজি শিক্ষিত নায়ক রামচন্দ্র এক ব্রাহ্ম বন্ধুর অনুরোধে নিজ বিধবা শ্যালিকার পুনর্বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করলে, বিধবাটি পুনর্বিবাহে সম্মত না হয়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে গেছে।

আবার, লক্ষ্য করা যায়, বৈধব্যের দুর্ভোগ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো কোনো হিন্দু বিধবা সমকালে বিধর্মী হয়েছিলেন। অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র 'অগত্যাস্বীকার প্রকরণ' (১৮৬১) নাটকে দেখা যায়, নায়ক মন্মথ বিধবা যুবতী রাসবিহারাণীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে ধর্মান্তর করার জন্য এক খৃষ্টান ধর্মগুরুর শরণাপন্ন হয়। অজ্ঞাতনামা রচিত 'বিধবাবঙ্গবালা' (১৮৭৫) নাটকে অনুরূপভাবে একজন ব্রাহ্মণ বিধবাকে প্রলুব্ধ করে ধর্ম্ম নষ্ট করার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

উপসংহার :

বস্তুত 'উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ' শিরোনামের গবেষণা কাজে আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি নাট্যসংলাপে বিধবাদের হৃদয় যন্ত্রণা, অসহায়তা, পুনর্বিবাহ উত্তর জীবনের সমস্যা সংকট ও মিলনের প্রতিচ্ছবি। প্রতিপক্ষের সমালোচনা, রঙ্গতামাসা, মুখোরোচক গল্প, বিরোধিতা, বৈধব্য আচার ও পরিবার জীবনের সংকট, সমাজ অনুশাসন কীভাবে নাটকের চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাট্যসাহিত্যে তাঁর অন্বেষণ আমাদের লক্ষ্য। বিধবাদের জীবন রক্ষার তাগিদে কিভাবে বেশ্যাবৃত্তিতে গমন —তার নাট্য কাহিনী সংলাপ পরম্পরায় আমরা বুঝে নিতে চাই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, চরিত্রের স্বগত কথনে। নাটকীয় একোক্তি ও চরিত্রের আক্ষেপ উক্তির মধ্যে বৈধব্যের জ্বালা, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের বাস্তব সত্যই শতাব্দীকাল দূরে দাঁড়িয়ে আমরা অনুসন্ধান করতে চাই সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

———